বিশ্ববিদ্যালয় জীবন

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

| ঢাকা , শুক্রবার, ১২ অক্টোবর ২০১৮

শেষপর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষকতা জীবন শেষ হতে শুরু করেছে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি চব্বিশটি বছর কাটিয়ে দিয়েছি। চব্বিশ বছর হচ্ছে দুই যুগ। অনেক বড় একটি সময়। এত দীর্ঘ একটা সময় এক জায়গায় থাকলে সেখানে শিকড় গজিয়ে যায়, সেই শিকড় টেনে উপড়াতে কষ্ট হয়, সময় নেয়। আমি সেই সময়সাপেক্ষ কঠোর প্রক্রিয়া শুরু করেছি।

চিন্তা করলে মনে হয়, এই তো মাত্র সেদিনের ঘটনা। প্রথম যখন এসেছি যোগাযোগ করার জন্য টেলিফোন পর্যন্ত নেই। ঢাকায় মায়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য কার্ডফোন ব্যবহার করার চেষ্টা করি। টেলিফোন কার্ডের টাকা খেয়ে হজম করে ফেলে কিন্তু কথা শুনতে পারি না। বাচ্চাদের স্কুল নেই, যেটা আছে সেখানে নেয়ার যানবাহনও নেই। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের বেতন যৎসামান্য, ভাগ্যিস কয়েকটা বই লিখেছিলাম রয়েলিটির টাকা দিয়ে সংসারের খরচ চলে যায়। এরকম ছোটখাটো যন্ত্রণার কোন শেষ ছিল না; কিন্তু যখন পেছনে ফিরে তাকাই, তখন পুরো স্মৃতিটি মনে হয় একটা মধুর স্মৃতি।

মনে আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার কিছুদিন পর হঠাৎ এক দল ছাত্র এসে হাজির, তারা হাসি হাসি মুখে বলল, ‘স্যার টিলার উপর পিকনিক হচ্ছে। সবাই মিলে মাছ রান্না করেছি। চলেন স্যার, আমাদের সঙ্গে খাবেন।’ আমি সরল বিশ্বাসে আরেকজন শিক্ষক নিয়ে সেই মাছ খেতে গিয়েছি। পরদিন সকালে শুনি ছাত্রদের বিরুদ্ধে বিশাল অভিযোগ, তারা নাকি আগের দিন কোথা থেকে মাছ চুরি করে এনেছে। ভাইস চ্যান্সেলর রেগে আগুন; কিন্তু ছাত্রদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটিও বসাতে পারছেন না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন (আমি) এবং প্রক্টর (আমার শিক্ষক বন্ধু) আগের রাতে ছাত্রদের সঙ্গে সেই চুরি করা মাছ খেয়ে এসেছি। যে অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন এবং প্রক্টর অপরাধী সেই অপরাধের তদন্ত হয় কেমন করে? আমি আমার ছাত্রদের বুদ্ধি দেখে চমৎকৃত হলাম।

তবে কিছুদিনের ভেতরেই অবশ্য আমি নিজেই একটা তদন্ত করার দায়িত্ব পেলাম। তখন ছাত্র সংসদটি ছিল ছাত্রদলের হাতে। তারা সাংস্কৃতিক সপ্তাহের আয়োজন করেছে। সেখানে উপস্থিত বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল রাজাকারদের অপকর্ম নিয়ে। ছাত্রশিবিরের সেটা পছন্দ হয়নি তাই তারা ছাত্রদলের একজন নেতাকে ছুরি মেরে দিয়েছে। তদন্ত করে আমরা দোষী ছেলেটাকে বের করেছি, কিন্তু শাস্তি দেয়ার আগেই সে আলীগড়ে চলে গেল।

ছাত্রদলের ছেলেদের তখন মুক্তিযুদ্ধের জন্য এক ধরনের ভালোবাসা ছিল, তবে কিছুদিনের

ভেতরেই জামায়াত এবং বিএনপি জোট করার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও ভালোবাসা উঠে যেতে থাকে। আমার মনে আছে, শিবিরের ছাত্রের হাতে ছুরি খাওয়া ছাত্রদলের সেই নেতাকে একদিন ক্যাম্পাসে দেখলাম। সে শিবিরের ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে গলা ফাটিয়ে আমার বিরুদ্ধে সেøাগান দিচ্ছে! ভাষা অত্যন্ত অশালীন, লজ্জায় কান লাল হয়ে যাওয়ার অবস্থা।

আমি নিশ্চয়ই তদন্তে এক্সপার্ট হয়ে উঠেছিলাম, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব স্পর্শকাতর তদন্ত আমাকে দেয়া হতে থাকল। আমি হাবা-গোবা মানুষ, তখনও জানি না যে কোন কোন তদন্ত করতে হয় এবং কোন কোন তদন্ত করতে গিয়ে কালক্ষেপণ করে এক সময় হিমাগারে পাঠিয়ে দিতে হয়। তাই আওয়ামী লীগ আমলে ছাত্রলীগের কিছু মস্তানের তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট জমা দিয়ে সবাইকে বিপদে ফেলে দিয়েছি। একদিন আবিষ্কার করলামÑ ছাত্রলীগ আমাকে এবং আমাদের ভিসিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। ক্যাম্পাসে আসতে পারি না, খবর পেয়েছি তদন্তের আসামিরা গোলচত্বরে সোফা পেতে বন্দুক কোলে নিয়ে বসে আছে!

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমার এরকম ঘটনার কোন শেষ নেই। একবার বাসায় বোমা পড়েছে, সেটা নিয়ে খুব হইচই। সেই হইচই দেশ ছাড়িয়ে বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। কিভাবে কিভাবে আমেরিকায় বেল কমিউনিকেশন্স রিসার্চে আমার প্রাক্তন বস সেই খবর পেয়েছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ই-মেইল পাঠিয়েছেন, ‘তুমি

এই ই- মেইল পাওয়া মাত্র পরিবারের সবাইকে নিয়ে প্লেনে চেপে এখানে চলে এসো। এখানে পৌঁছানোর পর তোমার বেতন ঠিক করব।' আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারি না। তাকে অভয় দিয়ে ই-মেইল পাঠালাম। বললাম, ভয় পাওয়ার কিছু নেই! এখানে এটা আমার জন্য এমন কোনো ব্যাপার নয়, এটি আমার দৈনন্দিন জীবনের খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা!

কেউ যেন মনে না করে আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন বুঝি কেটেছে এরকম ঝক্কি-ঝামেলার ভেতর দিয়ে, মোটেও সেরকম কিছু নয়। বেশিরভাগ সময় কেটেছে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। সেই সময়টি হচ্ছে জীবনের পরম পাওয়া। তাদের সঙ্গে গেলেই মনে হতো আমি বুঝি আবার নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে গেছি। কোনো দায়দায়িত্ব নেই, সময়টি রঙিন চশমা চোখে পৃথিবীটাকে দেখার, নিরবচ্ছিন্নভাবে আনন্দ করার। তাই যেদিন সিলেটে ঝুম বৃষ্টি নামে, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এসে পৃথিবীটাকে ভাসিয়ে নেয় আর ছাত্রছাত্রীরা বলে, 'স্যার চলেন বৃষ্টিতে ভিজি' আমি সঙ্গে সঙ্গে তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। আমি নিশ্চিত, আমার এ ছেলেমানুষী কাজকর্ম দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গুরুগম্ভীর শিক্ষকরা কৌতুক অনুভব করেছেন, অনেকে হয়ত বিরক্তও হয়েছেন; কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারেননি। কেমন করে বলবেন, আমার ছাত্রছাত্রীরা তো লেখাপড়াও করেছে। বাংলাদেশের এক কোনায় পড়ে থাকা ছোট এবং অখ্যাত একটি ইউনিভার্সিটি হয়েও তারা দেশের

বড় বড় ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়েছে। তাদের অনেকেই আমার কথা বিশ্বাস করে নিজেদের গড়ে তুলেছে। আমি সারাক্ষণ তাদের কানের কাছে বলে গিয়েছি, ক্লাসরুমে আমরা তোমাদের যেটা শেখাই সেটা হচ্ছে তোমার শিক্ষার পাঁচ পার্সেন্ট। বাকি পঁচানব্বই পার্সেন্ট শিখতে হবে নিজে নিজে ক্লাসরুমের বাইরে থেকে।

ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কাটানো সময়টুকু আমার জীবনের একটি অমূল্য সম্পদ। কিছুদিন আগে ছুরিকাহত হয়ে হাসপাতালে ছিলাম। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি বাসাতেও ফিরে যাইনি, সোজা এয়ারপোর্টে গিয়ে সিলেটে আমার ছাত্রছাত্রীদের কাছে চলে এসেছিলাম। আমি যখন ক্যাম্পাসে মাথা ঘুরিয়ে দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য শিক্ষক, তাদের বেশিরভাগই এক সময়ে আমার ছাত্র ছিল, আমার এক ধরনের আনন্দ হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময় তারা ভীরু পদক্ষেপে সসংকোচে এসেছে এখন তারাই বড় বড় প্রফেসর, বিভাগীয় প্রধান, ডিন! কত বড় বড় দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। একজন শিক্ষক তার জীবনে এর চাইতে বেশি আর কী চাইতে পারে?

বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই যুগ কাটিয়ে দিতে গিয়ে অনেক কিছু খুব কাছে থেকে দেখতে পেয়েছি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট-বল্টু নিজ হাতে লাগিয়েছি, খুলেছি এর সমস্যাটা কোথায় আমি খুব ভালো করে জানি। আবার কেমন করে এর সমস্যাটা মেটানো হয় সেটাও আমি খুব ভালো করে জানি।

কিছুদিন আগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সাংবাদিকেরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সম্মেলন করেছে। তারা আমাকে ডেকে নিয়ে গেছে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা করার জন্য। আমাকে জিজ্ঞেস করেছেÑ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা কী। আমি খোলাখুলি বলেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সমস্যা হচ্ছে ভাইস চ্যান্সেলর। আমি নিজের কানে শুনেছি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভাইস চ্যান্সেলর আমাকে বলেছেন, কোনো ভাইস চ্যান্সেলর যদি দাবি করেন তিনি কোনোরকম লবি না করে ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছেন, তাহলে তিনি হচ্ছেন ডাহা মিথ্যাবাদী (তার ব্যবহৃত শব্দটি ছিল ড্যাম লায়ার)। আমি হা করে তাকিয়েছিলাম এবং কল্পনা করছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসররা ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার জন্য নানা ধরনের লবি করে বেড়াচ্ছেন। লবি করা সংক্রান্ত যেসব গল্প আমরা শুনে থাকি সেগুলো মোটেও সম্মানজনক না।

আমার বক্তব্যটি সংবাদমাধ্যমে চলে এসেছিল এবং ভাইস চ্যান্সেলররা আমার ওপরে রাগ হয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন। যদিও বক্তব্যটি আমার নিজের নয়, আরেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ভাইস চ্যান্সেলরের। তারপরও আমি তাদের বিবৃতি নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করিনি। কারণ এ দেশে অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ভালো ভাইস চ্যান্সেলর আছেন, যারা খাটি শিক্ষাবিদ, যাদের স্বপ্ন আছে এবং তারা দেশকে যেমন ভালোবাসেন বিশ্ববিদ্যালয়কেও সেরকম

ভালোবাসেন। আবার সবাইকে মেনে নিতে হবে এ দেশে অনেক ভাইস চ্যান্সেলর আছেন, যাদের এত বড় দায়িত্ব নেয়ার ক্ষমতা নেই, শুধু ক্ষমতা ব্যবহার করে নানা ধরনের বাণিজ্য করার জন্য ধরাধরি করে ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছেন। আমার দুঃখটা এখানে, এ দেশে এখনও ধরাধরি করে ভাইস চ্যান্সেলর হওয়া যায়! আমরা কি দেখিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর যাওয়ার আগে শেষ দিনে পঞ্চাশ-ষাটজনকে একসঙ্গে মাস্টার রোলে নিয়োগ দিয়ে গিয়েছেন? সেই নিয়োগের সঙ্গে নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তাহলে শুধু একটা স্বাক্ষর দিয়ে তারা কত টাকা কামাই করেছেন, সেটা কেউ হিসাব করে দেখেছেন?

আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে আমি নূতন এক ধরনের জীবনে ফিরে যাব। বহুদিন থেকে আমি আমার নূতন জীবনের জন্য অপেক্ষা করছি! যাওয়ার আগে অনেক জোর দিয়ে একটি কথা বলে যেতে পারি, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঠিক করার জন্য সেখানে সত্যিকারের শিক্ষাবিদ স্বাপ্নিক ভাইস চ্যান্সেলরের নিয়োগ দিতে হবে। আমাদের দেশে এখন অর্থের অভাব নেই, অর্থের অভাবে আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দাঁড়াতে পারছিল না, এখন তারা খুব সহজেই দাঁড়াতে পারবে। শুধু দরকার একজন খাঁটি ভাইস চ্যান্সেলর।

বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতির বাইরে থেকে সচ্ছল বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সত্যিকার

বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে উঠার বিষয়টি দেখার জন্য আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকব।